

ছোটবেলায় "না-মানুষী বিশ্বকোষ" নামে একটা বই আমার খুব প্রিয় ছিল – প্রাণী জগতের মজার মজার সব তথ্য আর ছবিতে ঠাসা। সে বইয়ের একটা ছবি আমার এখনো চোখে ভাসে – এক অজগর একটা বিশাল বন বরাহকে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আস্ত। সাপ যাই খায় সেটার মাথা আগে গিলে, তারপর শরীরের আর বাকি অংশ। এখন অজগরটা গেলার সময় বুঝতে পারেনি শুকরটা এত বড়। কিছুটা গেলার পর সে এখন আর বাকি অংশটা গিলতেও পারছেনা, বেরও করতে পারছেনা – এসব ক্ষেত্রে বেশিভাগ সময় অজগরটা মারা যায়। যদি অনেক কষ্টে-সূটে সে শিকারটা গিলে ফেলতেও পারে তবুও অজগরটা খুবই অসহায় হয়ে যায়। মানুষ তাকে পিটিয়ে মারে বা অন্যান্য বড় পশু তাকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে ফেলে – সে গলায় খাবার নিয়ে অসহায় ভাবে দেখে, রা-টি কাড়তে পারেনা।

আজকাল খবরের কাগজ দেখলে এদেশকে আমার ঐ সাপের মতই লাগে। পশ্চিমা সভ্যতার শুকরটাকে আমরা হাভাতের মত মুখে ঢুকিয়েছি, গিলতে পারিনি। লাঠির বাড়ি আর হায়েনার নখের আঘাতে আমরা গাঁ-গাঁ করছি, শত্রুদের তাড়িয়ে দেয়া তো দূরে থাক চিংকারও করতে পারছি না।

মানুষ একটা যুক্তিবাদী প্রাণী। সে তার বিবেক-বোধ যৌক্তিকতার সাথে ব্যবহার করে পশুত্বকে দমন করে রাখে। যখন তার জৈবিক প্রবৃত্তির উপরে তার মন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। এখন এই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আপসে আসেনা। স্রষ্টা মানুষকে কিছু আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যা দিয়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। পশ্চিমা সভ্যতার সেকুলার শিক্ষা মানুষকে এই মূল্যবোধ শেখায় না। ফলে সমাজে তৈরি হতে থাকে পশু। বড় দুঃখ লাগে যে আমাদের সমাজপতিরা এই পশুদের অত্যাচার থেকে হাত পেতে পশ্চিমা দাওয়াই খোঁজেন, ঘায়ে এসিড ঢেলে চামড়া পুড়িয়ে ফেলেন – অসুখ পেয়ে যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মানুষ বায়োলজিক্যালি একটা প্রাণী। এর ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, যৌন তাড়না আছে। মানুষকে স্রষ্টা এভাবেই তৈরি করেছেন। মানুষের বায়োলজিক্যাল চাহিদা যখন পূরণ না হয় তখন একটা পর্যায়ে তার মনের শাসন আর শরীর মানেনা – এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। যেমন কোন মানুষ যদি পানিতে ডুবে যায় তখন সে সচেতনভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে নিঃশ্বাস না নিতে। কিন্তু কয়েকমিনিট পর জোর করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার মেকানিসমটা নষ্ট হয়ে যায়, ফুসফুস আপনাআপনি বাতাস ভরার পথ খুলে দেয়। এর ফলে ফুসফুসে পানি ঢুকে মানুষটা মারা যায়। অথচ অক্সিজেন ছাড়া মানুষ প্রায় আধঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে!

ধরুন রংপুরের চরম মঙ্গাপীড়িত একটা গ্রাম। মানুষজন দিনে একবার খায় – তাও কচুর শিকড় সেদ্ধ, ভুসি আর আটার গোলা। আমি সপরিবারে সেখানে গেলাম প্রশাসক হয়ে। আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অনেক সম্পদ আছে, বেতন-উপরি মিলিয়েও কামাই কম না। আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান খাওয়া দাওয়া। আমি খাবার জন্য গরু জবাই করলাম, খাসি কাটলাম, মুরগি পটকালাম। পুকুরে জাল ফেলে ধরলাম বুড়ো রুই, বড় কাতল আর বাঘা বোয়াল। পোলাওতে এতটাই ঘি ঢালা হলো যে তার সুবাস গ্রামের শেষ প্রান্তের অন্ধ বুড়ির দরজাতেও গিয়ে কড়া নেড়ে আসলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে রান্না আর খাওয়া-দাওয়া সবই করা হচ্ছে বাড়ির সামনের খোলা মাঠটিতে। আমি সপরিবারে খেতে বসলাম খোলা ময়দানে। মাথার উপর চাদর আছে বটে কিন্তু চারপাশে কোন রাখঢাক নেই। কোটরে ঢোকা চোখ নিয়ে সারা গ্রামের ছেলেপেলে আমার খাওয়া দেখছে। খাওয়া দেখছে সে বুড়োটা যে ক্ষুধার জ্বালায় সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেনা। মনের চোখ দিয়ে খাওয়া দেখছে সেই অন্ধ বুড়িটাও।

আমার যদি বিবেক বলে কিছু থাকে তবে বুঝব ঘটনাটা ঠিক হয়নি। ভুখা মানুষের না দিয়ে খাওয়াই একটা অন্যায়। আর তাদের

সামনে বসে তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে এমন খাবার খাওয়া যার খরচ দিয়ে তাদের সবার ডাল-ভাত হয়ে যেত – এটা কোন মাপের অন্যায়?

কিন্তু আমি বিবেকহীন। রাতেও একই ঘটনা ঘটলাম। পরের দিনও। প্রতিদিন একই ঘটনা চলতে থাকলে একদিন কি মানুষ জেগে উঠবেনা? আমার মুখের খাবার কেড়ে নেবেনা? যদি নেয় তখন কি তাকে খুব দোষ দেওয়া যায়?

প্রেম্পাপটটা একটু বদলাই। আমি সুবোধ টাইপের একটা ছেলে। ছোটবেলা থেকে যে মিশনারি স্কুলে পড়ে এসেছি, সেখানে কোন মেয়ের বালাই নেই। প্রকৃতির নিয়মে শরীরে দিন বদলের ডাক এসেছে। ছাদ থেকে বারান্দায়, সেখান থেকে ঘরের জানালায় অস্থির আমি। কি যেন খুঁজে বেড়াই। বাবা-মার কানের কাছে অবিরাম ঘ্যানর ঘ্যানর করে অবশেষে ভর্তি হলাম কোচিং-এ। সেখানেই খুঁজে পেলাম পিছনের পাড়ার সেই মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে – কী সুরেলা তার গলার স্বর, কী চমৎকার তার হাতের লেখা। স্যার পড়ানোর ফাকে তো বটেই, বাসায় অবধি বই খোলা রেখে আমি তাকে দেখতে পাই। বিছানায় শুয়ে চোখ মুদলেও আমি তাকেই দেখি। একদিন কোচিং থেকে বেরোনোর সময় সাহস করে বলে ফেললাম – দাড়াও, কথা আছে। সে পাত্তাই দিলনা। মরিয়া হয়ে সব আবেগ ঢেলে চিঠি লিখলাম। চকিতে তার হাতে দিলাম পাড়ার মোড়ে, একটা গোলাপ সহ। চিঠিটা পড়লোও না! ছিড়ে মুখে ছুড়ে মারলো আমার। আমি অপমানিত, লাঞ্চিত। কই কোন উপন্যাসে তো এমন ঘটেনি কোনদিন। কোন নাটকে হয়নি। কোন সিনেমাতে না। তবে আমি কী দোষ করলাম? নিজের ভেতর কুঁকড়ে যাবার সাথে সাথে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমিও চূড়ান্ত অপমান করব ওকে।

আবার প্রেম্পাপট বদলাই। আমি সুস্থ সবল একটা ছেলে। মোটর সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করি। শরীরে যৌবন এসেছে অনেক দিন হল। হলে গিয়ে এক টিকিটে দু ছবি দেখি আর হাত এবং কোলবালিশের সখ্যতায় দিন চলে। অভাবের সংসার তাই বিয়েও করতে পারিনা। হঠাৎ সেদিন ব্রেক ঠিক করাতে একটি ধনীরা দুলাল আসলো। তার পিছনে বসা সাদা গেঞ্জি পড়া এক দুলালী। বুকের থেকে চোখ নামাতে পারছিলামনা। গায়ে কি যেন মেখেছে, কাছে যেতেই মাথা ঘুরতে লাগল। অনেক কষ্টে কাজ সারতে সারতে দেখলাম মেয়েটার হাত খেলা করছে ছেলেটার শরীরে। ধোঁয়া ছেড়ে যখন চলে গেল ওরা তখন পিছন থেকে আমি দেখছি ভার্জিনের বোতল। এরপর থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য একটাই। এ মেয়েটির শরীর আমি চাইই চাই – এক রাতের জন্য হলেও চাই। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি আমার মত দোকানের আর তিন জনও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একই দিকে তাকিয়ে। ওরাও কি তবে... আমার মতই ভাবছে?

একটা ছেলে বায়োলজিক্যালি যৌবনপ্রাপ্ত হয় তের থেকে পনের বছর বয়সে, স্বপ্নকালীন বীর্যপাতের মাধ্যমে। আমাদের দেশে বিয়ে করার জন্য ন্যূনতম বয়স একুশ বছর। স্রষ্টা পরিবার গঠনের যে সামর্থ্য একটা পুরুষকে দিয়ে দিলেন সে সামর্থ্য রাষ্ট্র চেপে রাখল ছয় থেকে আট বছর। কি অদ্ভুত সেই আইন! নিয়মমাফিক বিয়ে করতে পারবেনা কেউ এই সময়ে কিন্তু অবৈধভাবে যে কারো সাথে শোয়া যাবে। একটা মেয়ে বায়োলজিক্যালি সন্তান ধারণের যোগ্যতা অর্জন করে বার থেকে চৌদ্দ বছরে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে হলে আঠার বছর হতে হবে। এ সময় সে কীভাবে দেহের ক্ষুধা মেটাবে? বিয়ের ফলে সন্তান হলে সাংবাদিকের দল ছুটে আসবে বাল্যবিবাহের হট স্টোরি কাভার করতে, বিয়ে ছাড়া সন্তান হলে নারীবাদীরা আসবে ছুটে – কিশোরী মাকে রক্ষা করতে, তার সন্তানকে হেফাজত করতে।

আমাদের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি নেই বরং ব্যভিচারে বাধা দিলে তার শাস্তি আছে! যে রাষ্ট্র বিয়ে করে শরীরের জ্বালা মেটালে জেলে পুরবে সেই রাষ্ট্র বিয়ে না করে একই কাজ করলে চোখ বন্ধ করে থাকবে!

এবার দ্বিতীয় আসামী – সমাজ। ধরা যাক একটা ছেলের বয়স একুশ বছর, সে কি বিয়ে করতে পারবে? তার বাবা-মা বলবে পড়াশোনা শেষ কর। তারপর চাকরি কর, তারপর চাকরি করে কিছু টাকা জমাও – তারপর? হ্যা, এবার বিয়ে করলেও করতে পারো। স্কুল-কলেজ আর ইউনিভার্সিটির সতের বছরের (সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হলে বিশ) পড়াশোনা শেষ করে অন্তত পাঁচ বছর চাকরি করার পর একটা ছেলের বয়স হয় ত্রিশ। ঝরণা যেমন বসে থাকেনা তেমন যৌবনও বসে থাকেনি। একটু ডিস্কো টাইপের হলে আসল নারীদেহের স্বাদ পাওয়া হয়ে যায় এর মধ্যেই। অল্প কয়টা পয়সা দিলে গার্মেন্টসের মেসে থাকতে দেয়

দু'ঘন্টা। আর তপ্ত যৌবন নিয়ে আমার ব্যাকুল বান্ধবীরা তো আছেই।

হাবলা বা অপেক্ষাকৃত সৎ টাইপের ছেলেগুলোর ভরসা এক্স মার্কা ছবি আর লক্ষ লক্ষ পর্নসাইট। বাবা-মা বেশ জানেন ছেলে বাথরুমে গিয়ে কী করে, দরজা লাগিয়ে কম্পিউটারে কী দেখে। তবু উট পাখির মত বালিতে চোখ গুঁজে থেকে বলেন – ‘এ বয়সের দোষ’। আচ্ছা বয়সের দোষে ছেলেটা যদি ভার্চুয়াল জগতের কাজগুলো আসল জগতে করতে চায় তাহলে সবার এত আপত্তি কেন?

আমাদের কালের কঠ পত্রিকা আধাপাতা জুড়ে জোলি-বিপাশার ছবি ছেপে যৌনাবেদনের স্ট্যান্ডার্ডঠিক করে দিচ্ছে। আমাদের প্রথম আলো বিতর্কউৎসবের নামে অনেক কটা মেয়েকে আমার বয়'স স্কুলে এনে ঢোকাচ্ছে আমাদের চেনা-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, সন্ধ্যায় একটা ব্যান্ড শোও আয়োজন করে দিচ্ছে একটু কাছাকাছি হবার জন্য। আমাদের ব্র্যাক ভার্টিটি টার্কের নামে ছেলে-মেয়েদের পাশের বিন্দিং-এ রাখছে, প্রেমের নামে ছেলে-মেয়ে একসাথে নাচতে বাধ্য করছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হুআজাদ বইয়ে প্রশ্ন করেন একটা মেয়েকে ঘরে আনলে কী হয়? কনডম আছে, পিল আছে; পেট না বাঁধলেই হল। খারাপ কাজ কর, কিন্তু সমাজ যেন না জানে। আমাদের মুক্তমনা সোশ্যাল ডারউনিস্টরা তত্ত্ব শেখায় ধর্মণে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বাড়ে। এটা তাই মনুষ্য জাতের টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক!

– আমরা জ্ঞান অর্জন করতে থাকি।

আমাদের বাবা-মারা ডিশের লাইন ঘরে এনে দেশী গার্লের বিদেশী দেহ দেখিয়ে ছেলেদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আমাদের লাক্স বিউটি শোতে বিন্দু আর মমরা শাড়ী বাঁকা করে পড়ে এসে আমাদের মনে ঢেউ তুলছে, কার কোমর কত বাঁকা সে হিসাব করে তাদের এসএমএস পাঠাতে বলছে। আমাদের বেরাদর ফারুকি ফাঁকা আপ্যার্টমেন্ট আর নৌকাতে লীলাখেলা করবার আইডিয়া আমাদের মাথায় ঢোকাচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে বোঝাই যায়না কী বিক্রি হবে গ্রামীণ ফোনের সিম না একটা গ্রাম্য নারী? আড়ং এর দুধ না নারীর? আমাদের নগর বাউল গান বেঁধে জানায় একা চুমকি পথে নামলে তার পিছু নেয়াই রীতি।

– আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে থাকি।

আমাদের রাস্তার মোড়ে বড় বিলবোর্ডলাগিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় – ভাসাভির সূক্ষ শাড়ী দিয়ে কিভাবে নাভি ঢেকেও খোলা রাখা যায়। ড্রেসলাইনের পুরুষ মডেল আমাদের শিখিয়ে দেয় কিভাবে আলগা নাভিতে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। আমাদের ভাবীরা পিঠের চওড়া জমিনের শুভ্রতা প্রকাশ করে পয়লা বৈশাখকে ডাকে। আমাদের বোনেরা গলায় রুমাল ঝুলিয়ে টাইট ফতুয়া টাইটতর জিন্স প্যান্ট সহযোগে পড়ে বসুন্ধরায় বাতাস খেতে যায়। আমাদের হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে যা খুশি পড়বে কিছু বলা যাবেনা।

– আমরা উন্মুখ চাতকেরা উন্মুখা চাতকীদের করা ইশারা পেয়ে যাই।

কিন্তু রাষ্ট্র আর সমাজ কি চায় আমাদের কাছে? আমরা সেই সব ভুখা মানুষদের মত যাদের সামনে দিয়ে পোলাও-কোর্মা আর মুরগির ঠ্যাং যাবে আর তারা হাঁ করে দেখে বলবে আহা কি চমৎকার খাবার; কিন্তু তাদের একটুও খেতে ইচ্ছে করবেনা? আমরা আদমের সেই সব পুরুষ সন্তান যারা একজন সঙ্গীনের অভাবে মনে মনে মরবে। আমাদের সামনে নানাভাবে নারীর মাংশ উপস্থাপন করা হবে আর আমাদের ধজ্জডঙ্গ-ঋষির নির্লিপ্ততায় তা উপেক্ষা করে যেতে হবে?

যে ভদ্রলোকটা টকশো আর পত্রিকায় বিবৃতি দেয় ইভ টিজিং এর বিরুদ্ধে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলার তার ভন্ডামির মুখোশে আমি খুতু দেই। আমি খুতু দেই সেই সমাজপতির নষ্টামিতে যে একটা বেকার ছেলের একটা কাজের ব্যবস্থা করেনা যাতে সে একটা বিয়ে করতে পারে; কিন্তু তাকে বখাটে ছেলের তকমা লাগিয়ে জমি আর রাজপথ দখলের কাজে লাগায়। আমি খুতু দেই এই সমাজের মুখে যা আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তির পরের পনের বছরের পুরোটা সময় ধরে এডাম টিজিং করে আজ আমাকে ইভ টিজার বানিয়েছে।

আইন করে, 'জনমত' গঠন করে ইভ টিজিং বন্ধ করা যায়নি, যাবেওনা। সেক্যুলার না মানুষকে মুসলিম হতে শেখাতে হবে। এত কষ্ট করে আইন না বানিয়ে আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে নিতে হবে। ইভ টিজিং কেন বাংলাদেশ সব পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের সব সমস্যার একটাই ম্যাজিক বুলেট আছে – ইসলাম। আমার মেয়েকে ইভ টিজিং এর হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে হিজাব পরাই, মুসলিমাহ বানাই। সমাজকে রক্ষা করতে চাইলে আমার ছেলেকে চোখ নামিয়ে চলতে শেখাই, মুসলিম হতে শেখাই, তাড়াতাড়ি বিয়ে দেই।

রাস্তার মোড়ের বখাটে ছেলেগুলোর নষ্ট হবার পেছনে আমাদের অবদান আছে বৈকি। খারাপ হবার উৎসগুলো বন্ধ না করলে নিত্য-নতুন খারাপ আসতেই থাকবে? নষ্টামির গাছের গোড়ায় পানি আর সার ঢেলে পাতা ছাটাই করলে কি কোন লাভ হবে?

ইসলামের বাঁধন দিয়ে মানুষের ভিতরের পশুটাকে বেঁধে না রাখলে আমাদের সমাজ ঐ অজগরের মত মরে যাবে। নিশ্চিত যাবে। অবধারিত যাবে।